

নয়নচারা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ুরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটা সত্যি ময়ুরাক্ষী-রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালোশ্রোত কল-কল করে, দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলে ডিজিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বসহা আশার মতো মৃদু মৃদু জ্বলে।

তবে ঘুমের শ্রোত সরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে: ময়ুরাক্ষী! কোথায় ময়ুরাক্ষী? এখানে তো কেমন ঝাপসা গরম হাওয়া। যে হাওয়া নদীর বুক বেয়ে ভেসে আসে সে হাওয়া কি কখনো অত গরম হতে পারে? ফুটপাতে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড় যেন। কিন্তু দুপুরের দিকে লঙ্গরখানায় দুটি খেতে পেয়েছিল বলে তবু তাদের ঘুম এসেছে-মৃত্যুর মতো নিঃসাড় নিশ্চল ঘুম। তবে আমুর চোখে ঘুম নেই, শুধু কখনো-কখনো কুয়াশা নামে তন্দ্রার এবং যদিবা ঘুম এসে থাকে, সে-ঘুম মনে নয়-দেহে; মন তার জেগে রয়েছে চেনা নদীর ধারে, কখনো কলপনায় কখনো নিশ্চিত বিশ্বাসে, এবং শুনছে তার অবিশ্রান্ত মৃদু কলস্বন, আর দূরে জেলেডিজিগুলোর পানে চেয়ে ভাসছে। ভাবছে যে এরই মধ্যে হয়তোবা ডিজির খোদল ভরে উঠছে বড় বড় চকচকে মাছ- যে চকচকে মাছ আগামীকাল চকচকে পয়সা হয়ে ফিরে ভারী করে তুলবে জেলেদের টাঁক। আর হয় তো বা, কী হয় তো বা?

কিন্তু ভুতনিটা বড় কাশে। খক্কক খক্কক খ-খ-খ। একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না, কেবল কাশে আর কাশে, শুনে মনে হয় দম বন্ধ না হলে ও কাশি আর থামছে না তবু থামে আশ্চর্যভাবে, তারপর সে হাঁপায়, কাশে কখনোবা কাশে না বটে তবে তার গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ হয় একটানা যেন ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-চাকায় শব্দতুলে সে কোথায় চলেছে যে চলেছেই। তাছাড়া সব শান্ত, নীরবতা পাখা গুটিয়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে আর জমাট বন্ধ ঘনায়মান কালো রাত্রি পর্বতের মতো দীর্ঘ, বৃহৎ ও দুর্লভ্য।

ভুতনিটা এবার জোর আওয়াজে কেশে উঠলো বলে আমুর মনে কুয়াশা। সে ভরা চোখে তাকালো ওপরের পানে-তারার পানে এবং আকস্মাৎ অবাক হয়ে ভাবলো, এই তারাগুলিই কি সে বাড়ি থেকে চেয়ে চেয়ে দেখতো? কিন্তু সে তারাগুলোর নিচে ছিল ঢালা মাঠ, ভাঙা মাটি, ঘাস, শস্য আর ময়ুরাক্ষী। আর এ তারাগুলোর নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েছে শুধু হিংসাবিদ্বেষ, নির্ভুরতা, অসহ্য বৈরিতা।

কিন্তু তবু ওরা তারা। তাদের ভালো লাগে। আর তাদের পানে চাইলে কি যেন হঠাৎ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বিপুল বাহু মেলে আসে, আসে। কিন্তু যা এসেছিল, মুহূর্তে তা শূন্য রিক্ত করে দিয়ে গেলো। কিছু নেই। শুধু ঘুম নেই। কিন্তু তাই যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে। নদীতে জোয়ার না ভাটা? মনে হচ্ছে ভাটা, এবং এ ভাটাতে ভেসে যাবার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে তার। সে ভেসে যাবে, যাবে, প্রশস্ত নদী তাকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, দূরে, বহুদূরে- কোথায় গো? যেখানে শান্তি-সেইখানে? কিন্তু সেই শান্তি কি বিস্তৃত বালুচরের শান্তি?

তবে এখানে মানুষের পায়ের আওয়াজ হয়। আর এখানে শহর। মন্বরগতিতে চলা একজোড়া পায়ের আওয়াজ ঘুরে আসছে গলি দিয়ে, এবং নদীর মতো প্রশস্ত এ রাস্তায় সে যখন এলো তখন আমু বিস্মিত হয়ে দেখলো যে লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলছে, আর সে-চোখ হীনতার ক্ষুদ্রতম ও ক্রোধে রক্তবর্ণ।

হয়তোবা সেটা শয়তানের চোখ নয়, হয় তো শুধুমাত্র একটা বিড়ি। তাহলে অদৃশ্যপ্রায় কালো শয়তানের হাতে বিড়ি, যেটা দুলছে কেবল তার হাতের দোলার সাথে। শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে যায় ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন জ্বলে ওঠে। তবে শুধু এই বিস্ময়-ই; ভয় করে না একটু-ওঃ বরঞ্চ সে যেন শয়তানের সাথে মুখোমুখি দেখা করবার জন্য অপেক্ষমান। তাছাড়া রাস্তার অপর পাশের বাড়িটার একটা বন্ধ জানালা থেকে যে উজ্জ্বল ও সরু একটা আলো রেখা দীর্ঘ হয়ে রয়েছে, সে, আলো রেখায় যখন গতিরুদ্ধ স্তব্ধতা, তখন শয়তানের হাতে আগুন জ্বলতে দেখলে আরো ক্রোধ হয় মানুষের। আগুনটা দুলছে নাতো যেন হাসছে; আমুরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রনায় কঁকায়-তখন পথ চলতি লোকেরা যেমন আলাদা অপরিচিত দুনিয়ার কোন অজানা কথা নিয়ে হাসে, এ-ও যেন তেমনি হাসছে। কিন্তু কেন হাসবে? দীর্ঘ উজ্জ্বল সে রেখাকে তার ভয় নেই? জানে না সে যে ওটা খোদার দৃষ্টি-অকম্পিত দ্বিধাশূন্য ঋজু দৃষ্টি? তবু আলো-কণা হাসে, হাসে কেবল, পেছনে কালো শয়তান কালো রঙে হাসে। তা হাসুক, আলাদা দুনিয়ায় হাসুক, কারো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এ-দুনিয়ায়-যে-দুনিয়ায় ঘর ছেড়ে লোকেরা কালো নদীর ধারে ধারে পড়ে রয়েছে ভাটির টানে ভেসে যাবে বলে, যে দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবে না-দেবে না।

তবু কালো শয়তান রহস্যময়ভাবে এগিয়ে আসছে। শূন্য ভাসতে ভাসতে যে এগিয়ে আসছে ক্রমশ এসে কী আশ্চর্য, আলো রেখাটাও পেরিয়ে গেল নির্ভয়ে এবং গতিরুদ্ধ দীর্ঘ সে রেখা বাধা দিলো না তাকে। মৃতগতির পানে চেয়ে নদীর বুকে তারপর নামলো কুয়াশা আমুর চোখে পরাজয় ঘুম হয়ে নামলো। পরায় মনে নেয়াতে-ও যেন শান্তি।

রোদদগ্ধ দিন খরখর করে। আশ্চর্য কিন্তু একটা কথা: শহরের কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই। এখানে মানুষের চোখে, এবং দেশের কুকুরের চোখে বৈরিতা। তবুও ভালো।

ময়রার দোকানে মাছি বোঁ বোঁ করে। ময়রার চোখে কিন্তু নেই ননী-কোমলতা, সে চোখময় পাশবিক হিংস্রতা। এত হিংস্রতা যে মনে হয় চারধারে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুটো ভয়ঙ্কর চোখ ধকধক করে জ্বলছে। ওধারে একটা দোকানে যে ক-কাড়ি কলা ঝুলছে, সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়। ওগুলো কলা নয় তো, যেন হলুদ রঙা স্বপ্ন ঝুলছে। ঝুলছে দেখে ভয় করে-নীচে কাঁদায় ছিঁড়ে পড়বে কি হঠাৎ? তবু শঙ্কা ছাপিয়ে আমুর মন উর্ধ্বপানে মুখ করে কেদে ওঠে, কোথায় গো, কোথায় গো নয়নচারা গাঁ?

লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্ছে; রক্ত ছুটছে। যেমন করিম মিয়ার মুখ দিয়ে সেদিন ফিনকি দিয়ে ছুটেছিল রক্ত। তবে মেয়েটার গলার নিচেটা সাদা, এত সাদা যে মনটা হঠাৎ স্নেহের ছায়ায় ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়বার জন্য খাঁ খাঁ করে ওঠে। মেয়েটি হঠাৎ দুটি পয়সা দিয়ে চলে গেল রক্ত ঝলকিয়ে। কিন্তু একটা কথা: ও কী জানে না-আসলে ও চুল কার। ও-চুল নয়নচারা গাঁয়ের মেয়ে ঝিরার মাথার ঘন কালো চুল।

কিন্তু পথে কতো কালো গো। অদ্ভুত চাঞ্চল্যময় অসংখ্য অগুনতি মাথা; কোন সে অজ্ঞাত হাওয়ায় দোলায়িত এ-কালো রঙের সাগর। এমন সে দেখেছে শুধু ধানক্ষেতে, হাওয়ায় দোলানো ধানের ক্ষেতের সাথে এর তুলনা করা চলে। তবু তাতে আর এতে কত তফাৎ। মাথা কালো, জমি কালো, মন কালো। আর আর দেহের সাথে জমির কোন যোগাযোগ নেই, যে হাওয়ায় তারা চঞ্চল কম্পমান, সে হাওয়ায় দিগন্ত থেকে উঠে আসা সবুজ শস্য কাঁপানো সুস্পষ্ট অন্তরঙ্গ হাওয়া নয়: এ-হাওয়া সে চেনে না।

অসহ্য রোদ, গাছ নেই। ছায়া নেই নিচে, কোমল ঘাস নেই। এটা কি রকম কথা: ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসছে অথচ ছায়া নেই ঘাস নেই। আরও বিরক্তিকর- এ কথা যে কাউকে বলবে, এমন কোনো লোক নেই। এখানে ইটের দেশে তো কেউ নেই-ই, তার দেশের যারা বা আছে তারাও মন হারিয়েছে, শুধু গোঙানো পেট তাদের হা করে রয়েছে অন্ধ চোখ চেয়ে।

তবু যাক, ভুতনি আসছে দেখা গেলো। কিরে ভুতনি? ভুতনি উত্তর দিলো না, তার চোখ শুধু ডাব ডাব করছে, আর গরম হাওয়াটায় জটা পড়া চুল উড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিরে ভুতনি? ভুতনি এবার নাক ওপরের দিকে তুলে কম্পান জিহ্বা দেখিয়ে হঠাৎ কদে ফেললে ভাঁ করে। কেউ দিলো না বুঝি, পেট বুঝি ছিড়ে যাচ্ছে? কিন্তু একটা মজা হয়েছে কি জানিস, কোথেকে একটা মেয়ে রক্ত ছিটাতে ছিটাতে এসে আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে চলে গেল, তার মাথায় আমাদের সেই ঝিরার মাথার চুল-তেমনি ঘন, তেমনি কালো। আর তার গলায় নিচেটা-। ভুতনির গলার তলে ময়লা শুকনো কাদার মতো লেগে রয়েছে। থাক সে কথা। কিন্তু তুই কাঁদছিস ভুতনি, ওরে ভুতনি?

কী একটা বলে ফেলে ভুতনি চোখ মুখ লাল করে কাশতে শুরু করলো। তার ভাই ভুতো মারা গেছে। কোন নতুন কথা নয়, পুরনো কথা আবার নতুন করে বলা হলো। সে মরেছে; ও মরেছে; কে মরেছে বা কে মরছে সেটা কোন প্রশ্ন নয়, আর মরছে মরছে কথা দু-রঙা দানায় গাঁথা মালা, অথবা রাস্তার দুধারের সারি-সারি বাড়ি-যে বাড়িগুলো অদ্ভুতভাবে অচেনা অপরিচিত, মনে হয় নেই অথচ কেমন আলাগোছ অবশ্য রয়েছে। ভুতনির কান্না কাশির মধ্যে হারিয়ে গেলো। কাশি থামলে ভুতনি হঠাৎ বলে, পয়সা? তার পয়সার কথাই যেন শুধোচ্ছে। হ্যাঁ, দুটো পয়সা আমুর কাছে আছে বটে কিন্তু আমু তা দেবে কেন? ভুতনির চোখ কান্নায় প্যাক-প্যাক করছে, আর কিছু কিছু জ্বলছে। কিন্তু আমু কেন দেবে? ভুতনি আরো কাঁদলো, আগের চেয়ে এবার আরো তীব্রভাবে। তাই দেখে জ্বলে উঠলো। চোখ যখন জ্বলে উঠলো তখন দেহ জ্বলতে আর কতক্ষণ: একটা বিদ্রোহ-একটা ক্ষুরধার অভিমান ধাঁধাঁ করে জ্বলে উঠলো সারা দেহময়। তাতে তবু মন যেন প্রতিহিংসার উজ্জ্বল উপসম।

সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে। বহু অচেনা পথে ঘুরে ঘুরে আমু জানালো যে ও-পথগুলো পরের জন্য, তার জন্য নয়। রূপকথার দানবের মতো শহরের মানুষরা সায়ন্তন গরাভিমুখ-চাঞ্চল্যে থরথর করে কাঁপছে। কোন এক গুহায় ফিরে যাবার জন্য তাদের এ-উগ্র ব্যস্ততা? সে গুহা কি ক্ষুধার? এবং সে গুহায় কি সুপীকৃত হয়ে রয়েছে মাংশের টিলা, ভাতের পাহাড়, মাছের স্তূপ? কত বৃহৎ সে গুহা?

অচেনা আকাশের তলে অচেনা সন্ধ্যায় আমুর অন্তরে একটা অচেনা মন ধীরে ধীরে কথা কয়ে উঠছে। ক্ষীণ তার আওয়াজ, তবু মনে হয় গুহার পানে প্রবাহিত এ বিপুল জলস্রোতকে ছাপিয়ে উঠছে তা। কী কইছে সে? অস্পষ্ট তার কথা অথচ সে অস্পষ্টতা অতি উগ্র: মানুষের ভাষা নয়, জন্তুর হিংস্র আত্ননাদ। কী? এই সন্ধ্যা না হয় অচেনা সন্ধ্যা হলো: রূপকথার সন্ধ্যাও তো সন্ধ্যা, কিন্তু তবু সন্ধ্যা, আর এ-সন্ধ্যায় তুমি আমাকে নির্মমভাবে কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ? কে তুমি, তুমি কে? জানো সারাআকাশ আমি বিষাক্ত রুম্ম জিহ্বা দিয়ে চাটবো। চেটে-চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাবো সে আকাশ দিয়ে-কে তুমি, তুমি কে?

আমুর সমস্ত মন স্তব্ধ এবং নুয়ে রয়েছে অনুতপ্ত অপরাধীর মতো। সে ক্ষমা চায়; শক্তিশালীর কাছে সে ক্ষমা চায়। যেহেতু শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়, সে ন্যায়ের প্রতি অন্যায় করা গুরুতর পাপ। সে পাপ করছে, এবং তাই সে ক্ষমা চায়: দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক। চারধারে তো রাত্রীর ঘন অন্ধকার, শক্তিশালীর ক্ষমা করার কথা জানবে না কেউ।

ওধারে কুকুরে কুকুরে কামড়াকামড়ি লেগেছে। মনের এ পবিত্র সান্ত্বনায় সে কোলাহলের তীব্র আওয়াজ অসহনীয় মনে হলো বলে হঠাৎ আমু দূর দূর বলে চেচিয়ে উঠলো, তারপর জানালো যে ওরা মানুষ, কুকুর নয়! অথবা ভেতরে কুকুর, বাইরে কুকুর নয়।

কিন্তু আমু মানুষ, ভেতরে বাইরে মানুষ। সে মাপ চায়। কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ উঠে পড়লো, তারপর অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিসের সন্ধানে যেন তাকালো রাস্তার ক্ষীণ আলো এবং দুপাশের স্বপ্নালোকিত জানালাগুলোর পানে। দোতলা তেতলা-আরো উঁচুতে স্বপ্নালোকিত জানালা ধরা-ছোয়ার বাইরে। তুমি কি ওখানে থাক?

তারপর কখন মাথায় ধোঁয়া উড়তে লাগলো। এবং কথাগুলো মাথায় ধোঁয়া হয়ে উড়ছে। উদরের অসহ্য তাপে জমাট কথাগুলো ধোঁয়া হয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর গলাটা যেন সুড়ঙ্গ। আমু শুনতে পারছে বেশ যে কেমন একটি অতি ক্ষীণ আওয়াজ সে-গভীর ও ফাঁকা সুড়ঙ্গ বেয়ে পেচিয়ে পেচিয়ে উঠে আসছে ওপরের পানে এবং অবশেষে বাইরে যখন মুক্তি পেলো তখন তার আঘাতে অন্ধকারে কেউ জাগলো চেউগুলো দু-ধারের খোলা চোখে-ঘুমন্ত বাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো তার কানে। মাগো চাট্টি খেতে দাও।

এই পথ, ওই পথ: এখানে পথের শেষ নেই। এখানে ঘরে পৌঁছানো যায় না। ঘর দেখা গেলেও কিছুতেই পৌঁছানো যাবে না সেখানে। ময়রার দোকানে আলো জ্বলে, কারা খেতে আসে, কারা খায়, আর পয়সা ঝনঝন করে: কিন্তু এধারে কাঁচ। কাঁচের এপাশে মাছি আর পথ আমু। তবু দাড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভেতর থেকে কে একটি লোক বাজের মত খাঁইখাঁই করে তেড়ে এলো। আরে লোকটি অন্ধ নাকি? মনে মনে আমু হঠাৎ হাসলো একচোট, অন্ধ না হলে এমন করবে কেন? দেখতে পেত না যে সে মানুষ?

পথে নেমে আমু ভাবলে, একবার সে শুনেছিলো শহরের লোকরা অন্ধ হলে নাকি শোভার জন্য নকল চোখ পড়ে। দোকানের লোকটি অন্ধই আর তার চোখে সে-নকল চোখ। কিন্তু একটা আওয়াজ শুনে হয়তো ভেবেছে বাইরে কুকুর, তাই তেড়ে উঠেছিলো অমন করে। কিন্তু সে কথা যাক, আশ্চর্য হতে হয় কান্ড দেখে। নকল চোখে আর আসল চোখে তফাৎ নেই কিছু।

তারপর মাথায় আবার ধোঁয়া উড়তে লাগলো। ময়ুরাক্ষীর তীরে কুয়াসা নেমেছে। স্তব্ধ দুপুর: শান্ত নদী। দূরে একটি নৌকায় খরতালে ঝনঝন করছে আর এধারে শ্মশানঘাটে মৃতদেহ পুড়ছে। ভয় নেই। মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুকে সে পেরিয়ে এসেছে, আর অলিগলি দিয়ে ঘুরে মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েছে। কড়া একটা গন্ধ নাকে লাগছে। কী কোলাহল, লোকেরা আসছে, যাচ্ছে। হোটেল। দাঁড়াবে কি এখানে? দাড়ালে দাড়াতে পারে, তবে নকল চোখ পরা কোন অন্ধ তো নেই এখানে, আওয়াজ পেয়ে তেড়ে আসবে না খাঁইখাঁই করে? কিন্তু গন্ধটা চমৎকার। তারপর বোশেখ মাসের শূন্য আকাশ হঠাৎ যেমন মেঘে ছেয়ে যায়,

তেমনি দেখতে না দেখতে একটা ভীষণ কালো ক্রোধে তার ভিতরটা করাল হয়ে উঠলো, আর কাঁপতে থাকলো সে থরথর করে: সিঁড়ির ধারে একটা প্রতিবাদী ভঙ্গিতে সে রইলো দাঁড়িয়ে। অবশেষে ভেতর থেকে কে টেঁচিয়ে উঠলো, আরেকজন দ্রুতপায়ে এলো এগিয়ে, এসে হীন ভাষায় কর্কশ গলায় তাকে গালাগালি দিয়ে উঠলো। এই জন্যেই আমু প্রস্তুত হয়ে ছিলো। হঠাৎ সে স্কিন্সের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর, এবং তারপর চকিতে ঘটিত বহু ঝড় ঝাপটার পর দেহে অসহ্য বেদনা নিয়ে আবার যখন সে পথ ধরলো, তখন হঠাৎ কেমন হয়ে একবার ভাবলে: যে-লোকটা তাড়া করে এসেছিলো সে-ও যদি ময়রার দোকানের লোকটার মতো অন্ধ হয়ে থাকে? হয়তো সে-ও অন্ধ, তার-ও চোখ নকল। শহরে এত-এত লোক কি অন্ধ? বিচিত্র জায়গা এই শহর!

চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর উত্তেজিত মাথা ঠাণ্ডা হতে সময় নিলো এবং সে উত্তেজনার মধ্যে কোন রাস্তা হতে কোন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে হঠাৎ একসময়ে সে থমকে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে ভাবলো: যে পথের শেষ নেই, সে পথে চলে লাভ নেই, বরঞ্চ ওই যে ওখানে কে কঁকাচ্ছে সেখানে গিয়ে দেখা যাক কী হয়েছে তার। ফুটপাথের ধারে গ্যাসপোস্ট, তার তলে আবছা অন্ধকারে কে একটা লোক শুয়ে রয়েছে, আর পেটে হাত চেপে দুরন্ত বেদনায় গোঙাচ্ছে। তার একটু তফাতে যে কয়টা লোক উবু হয়ে বসে রয়েছে তাদের মুখে কোন সাড়া নেই, শুধু তারা নিঃশব্দে ধুঁকছে। আমু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর আপন মনে থমকে ভাবলো, ওদের সঙ্গে তার চেনা নেই, ওদের বেদার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। সে কেন যাবে তাদের কাছে, যাবে না। তারপর কেমন একটা চাপা ভয়ে সে যেন ভাঙা পা নিয়ে পালিয়ে চললো। কী যে সে ভয় সে কথা সে স্পষ্ট বলতে পারবে না এবং সেকথা জানবারও কোন তাগিদ নেই শুধু যেন কেমন একটা ভয় হতে মুক্তি পাবার জন্যে সে পালিয়ে যাবে সে-রাস্তা দিয়েই, যে রাস্তার কোনো শেষ নেই। যে ছায়া ঘনিয়েছে মনে, তারও কী শেষ নেই? আর সে ছায়া কী মৃত্যুর?

অনেকক্ষণ পর তার খেয়াল হলো যে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, আর তার গলার সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেয়ে-বেয়ে উঠছে ওপরের পানে এবং যখন সে আর্তনাদ শুন্যতায় মুক্তি পেলো, রাত্রির বিপুল অন্ধকারে মুক্তি পেলো, অত্যন্ত বিভৎস ও ভয়ঙ্কর শোনালো তা। এ কি তার গলা-তার আর্তনাদ? সে কি উন্মাদ হয়ে উঠেছে? অথবা কোনো দানব কি ঘর নিয়েছে তার মধ্যে? তবু, তবু তার মনের প্রশ্নকে উপেক্ষা করে সুড়ঙ্গের মতো গলা বেয়ে তাক্ক, তীব্র, বিভৎস আর্তনাদের পর আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগলো, আর সে থরথর করে কাঁপতে লাগলো আপাদমস্তক। অবশেষে দরজার প্রাণ কাঁপলো, কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো, এসে অতি আস্তে আস্তে অতি শান্ত গলায় শুধু বললে: নাও।

কী? কী সে নেবে? ভাত নেবে। ভাতই কি সে চায়? সে ভাতই চায়: এ দুনিয়ায় চাইবার হয়তো আরও অনেক কিছু আছে, কিন্তু তাদের নাম সে জানে না। ব্রহ্ম ভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে সে ভাতটুকু নিলে, নিয়ে মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চেয়ে রইলো মেয়েটির পানে। মনে হচ্ছে যেন চেনা-চেনা। না হলে সে চোখ ফেরাতে পারবে না কেন!

নয়নচারা গ্রামে কি মায়ের বাড়ি?

মেয়েটি কোনো উত্তর দিলে না। শুধু একটু বিস্ময় নিয়ে কয়েকমুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

বিশ্লেষণ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গল্পের প্রধান প্রধান চরিত্রকে এই দুর্ভিক্ষ তাড়িত করেছে। তাঁর গল্পের কেন্দ্রচরিত্ররা শেষ পর্যন্ত শেকড় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যদিও জীবনের একটা সময়ে তাদের নাড়ি পোতা ছিল শ্যামল বাংলার কোনো না কোনো স্থানে।

সেই ছিন্নসত্তা-মানুষগুলোর মধ্যে অবলম্বন খোঁজার এক প্রবল তাড়না পরিলক্ষিত হয়। শেকড় উৎপাটিত সেই মানুষগুলো রুঢ় বাস্তবতার শিকার অথচ স্বপ্নতাড়িত, অবলম্বনহীন অথচ আশাবাদী, উন্মূলিত অথচ মূলের সন্ধানে অভিনিবেশী। ‘অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা’ র দ্বন্দ্বই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পের উপজীব্য।

ওয়ালীউল্লাহ মানুষের অন্তঃপৃথিবীকে অবলম্বন করে খ্যাতিকীর্তি গল্পগুলো লিখেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্প ব্যতিক্রমী তথা অনন্যমাত্রিক হওয়ার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন – ‘একদিকে পেশাঘটিত আভিজাতিক, আন্তর্জাতিক মানস-সংযোগ, অন্যদিকে নবোদ্ভূত মুসলিম সৃষ্টিশীল ও বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শ-সহযোগ’। মূলত রোমান্টিকতা ও ধর্মের মোহাচ্ছন্নতা ঝেড়ে ফেলে তিনি গল্পসাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন বাস্তবতার প্রত্ন-ইতিহাস। মানুষকে তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন যন্ত্রণা ও দুঃখের মধ্যে, নিঃসীম একাকিত্ব ও অসহায়ত্বের মধ্যে।

এরূপ একটি গল্প হলো নয়নচারা। দুর্ভিক্ষ প্রসীড়িত গ্রাম নয়নচারা। এই গ্রামের তিনজন অধিবাসী আমু, ভূতো আর ভূতনি শহরে এসেছে দু’ মুঠো ভাতের সন্ধানে। কিন্তু শহর বড় নির্মম। নির্ভুর হৃদয়বিদারক পরিবেশে আমুকে সান্ত্বনা দেয় ময়ূরাক্ষী নদী, যেমন করে জীবনানন্দকে শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন। শহরে তারা অবহেলিত। লঙ্গরখানার যৎসামান্য খাবারে তাদের সবার প্রাণ বাঁচে না। ক্ষুধার বিষাক্ত কামড়ে বেঘোরে প্রাণ হারায় ভূতো এবং আরো অনেকে। ভূতনি দানবীয় কাশির কবলে পড়েও দুর্মর জীবনকে টেনে চলে। স্মৃতি ভারাক্রান্ত আমুর মনে জাগে সুতীর ক্রোধ ও প্রতিহিংসা। ফুটপাতে শুয়ে আমু নিজের মধ্যে স্বপ্নকে প্রশয় দেয়। তার চোখে ভাসে ময়ূরাক্ষী নদী, ভাসে জেলে ডিঙি, মাছ। দয়াহীন এ শহরে মানুষের চেয়ে কুকুরের মূল্য বেশি। শহরবাসীরা আত্মকেন্দ্রিক। দীনজনের প্রতি নজর দেওয়ার মত ফুসরত বা মায়া তাদের নেই। স্বপ্নবিহারী আমু দোকানে ঝুলন্ত কলা দেখে ফেলে-আসা জীবনের স্মৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ক্ষুধাধীর্ণ, শান্ত-অবসন্ন আমু স্বপ্নালোকিত জানালাগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাত চায়।

কিন্তু তার আতর্কিতকার প্রাচীরে বাধা পেয়ে ফিরে আসে। শ্মশানঘাটের মরাপোড়ানোর গন্ধে সে বিচলিত হয় না, অস্থির হয় মানুষের মানবেতর আচরণে। শহরের আবহাওয়া, শহুরের আচরণ আমুকে ক্ষুব্ধ করে। ইটকাঠের মধ্যে জীবনযাপনকারী শহুরেদের মধ্যে সে নয়নচারা গাঁয়ের সুশোভন প্রাণবান মানুষগুলোকে অব্বেষণ করে। ক্ষুৎপ্রীড়িত শহুরে জীবনযাপন করেও সে নয়নচারা গাঁয়ের স্মৃতি-অব্বেষী। স্মৃতি-ভারাতুর আমু শহরের অলিতে গলিতে অন্নের জন্যে ঘুরে ফেরে। কিন্তু শহুরেরা আত্মকেন্দ্রিক। অন্যকে করুণা করার মানসিকতা তাদের নেই।

এইরকম পরিস্থিতিতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আমুর সামনে একটি দরজা খুলে গেল এবং ‘একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, এসে অতি আস্তে-আস্তে অতি শান্ত গলায় শুধু বললে-নাও’। মেয়েটি তাকে সামান্য ভাত দিল। রুধিরাক্ত শহরাভিজ্ঞ সেই আমুর সামনে, এই আনন্দময় বিপর্যস্ত সময়ে, চির চেনা নয়নচারা

গ্রাম ভেসে উঠল অকস্মাৎ। দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় এই ক্লিষ্ট মানুষটি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে ‘নয়নচারা গাঁয়ে কি মায়ের বাড়ি? মেয়েটি কোনো উত্তর দেয়নি। কারণ আমুর প্রশ্নের মমার্থ সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি।

কিন্তু পাঠকের কাছে আমুর মর্মবেদনা অপরিজ্ঞাত থাকে না। আমুর চেতনায় যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং তৎসৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার উপস্থিতি যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি দেখা যায় আমুর গোটা সত্তা জুড়ে নয়নচারা গাঁয়ের অনাবিল ছায়াভাস।

আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’ গ্রন্থে লিখেছেন- ‘নয়নচারা গল্পের বহির্বাস্তবে আছে ১৩৫০-এর ভয়াবহ মরুস্তর, অন্তর্বাস্তবে আছে শিষ্ণু, পল্লবঘন ময়ূরাক্ষী নদী-তীরবর্তী নয়নচারা গ্রামের সুশান্তি।

লেখক পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। জীবন-সন্ধানী ও সমাজসচেতন এ সাহিত্য-শিল্পী চট্টগ্রাম জেলার ষোলোশহরে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনিবাস ছিল নোয়াখালীতে। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পিতার কর্মস্থলে ওয়ালীউল্লাহর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনকে নানাভাবে দেখার সুযোগ ঘটে তাঁর, যা তাঁর উপন্যাস ও নাটকের চরিত্র-চিত্রণে প্রভূত সাহায্য করে। অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে আনন্দমোহন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে এমএ পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু ডিগ্রি নেওয়ার আগেই ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তিনি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক ‘দি স্টেটসম্যান’ -এর সাব-এডিটর নিযুক্ত হন এবং সাংবাদিকতার সূত্রে কলকাতার সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে করাচি বেতার কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন। এরপর তিনি কূটনৈতিক দায়িত্বে নয়াদিল্লি, ঢাকা, সিডনি, করাচি, জাকার্তা, বন, লন্ডন এবং প্যারিসে নানা পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল প্যারিস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপকভাবে সক্রিয় হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবরে তিনি প্যারিসে পরলোক গমন করেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যকর্ম সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। ব্যক্তি ও সমাজের ভেতর ও বাইয়ের সূক্ষ্ম ও গভীর রহস্য উদ্ঘাটনের বিরল কৃতিত্ব তাঁর। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে একদিকে যেমন স্থান পেয়েছে কুসংস্কার, অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসে আচ্ছন্ন, বিপর্যস্ত, আশাহীন ও মৃতপ্রায় সমাজজীবন, অন্যদিকে তেমনি স্থান পেয়েছে মানুষের মনের ভেতরকার লোভ, প্রতারণা, ভীতি, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। কেবল রসপূর্ণ কাহিনি পরিবেশন নয়, তাঁর অভীষ্ট ছিল মানবজীবনের মৌলিক সমস্যার রহস্য উন্মোচন।

‘নয়নচারা’ (১৯৪৬), ‘দুই তীর ও অন্যান্য গল্প’ (১৯৬৫) তাঁর গল্পগ্রন্থ। ‘লালসালু’ (১৯৪৮) ‘চাঁদের
অমাবস্যা’ (১৯৬৪) ও ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮) তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
নিরীক্ষামূলক চারটি নাটকও লিখেছেন। সেগুলো হলো: ‘বহিপীর’ , ‘তরঙ্গভঙ্গ’ , ‘উজানে মৃত্যু’ ও
‘সুড়ঙ্গ’ ।



মোঃ রায়হান খান

কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসই)

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

ই-মেইল: raihaankhancs@gmail.com